অ্যালান ম্যাথিসন টিউরিং (1912-1954): দিগন্তে উদ্ভাস বিষণ্ন স্মৃতি

অভিজিৎ লাহিড়ী

"ট্রেন ছেড়ে চলে গেছে; সময় আর নেই"।

অস্কার ওয়াইল্ড।

অ্যালান টিউরিং-এর জন্ম-শতবর্ষের বছর হ'ল এই 2012 সাল । স্বল্প পরিসরের জীবনে টিউরিং পরিচিত হয়েছিলেন তাঁর অনন্যসাধারণ মেধার জন্য, প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি তাঁর তাচ্ছিল্যের মনোভাবের জন্য, আর তাঁর ব্যতিক্রমী আচরণ-বিধির জন্য । তাঁর স্বভাবজাত কৌতুক আর খামখেয়ালীপনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আত্মহননের মধ্যে দিয়ে তিনি ভাবীকালের জন্য রেখে গেছেন একগুচ্ছ তীক্ষ্ম প্রশ্ন, বহু প্রশ্নের উত্তরের দিশা, আর এক রাশ বিষণ্নতা ।

টিউরিং-এর হাত ধরেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে গণনবিজ্ঞান নামক ফলিত গণিতের সেই শাখাটি, পরবর্তী পর্যায়ে ক্রমশ বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে যার অনন্ত সম্ভাবনা । তিনিই প্রথম ভেঙ্গে ফেলেন বিমূর্ত যুক্তিবিদ্যা আর ফলিত যন্ত্রবিদ্যার ভিতরকার দেয়ালটিকে । 1936 সালে, মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে 'গণন-যোগ্যতা' (computability) বিষয়ে তাঁর অনন্যসাধারণ অবদান রাখেন টিউরিং যা, বলা চলে, গণিত ও যুক্তিশাস্ত্রে সর্বকালের তাৎপর্যময় অবদানগুলির ভিতর অন্যতম ।

গণন-বিজ্ঞানের আধুনিক পর্যায়ের ইতিহাসের সূত্রপাত 'টিউরিং যন্ত্র'-এর ধারণা থেকে। এটি টিউরিং-এর কল্পিত এমন এক যন্ত্র, যার কিছু নির্দিষ্ট 'অভ্যন্তরীণ দশা' রয়েছে, এবং যেটি কাজ করে এক প্রস্থ সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে - সেই নিয়মতন্ত্রই হল ঐ যন্ত্রের পরিকল্পন (program)। বাইরে থেকে যন্ত্রকে সরবরাহ করা হয় কোন এক সংখ্যা, যন্ত্রের গণন-ক্রিয়ার ক্ষেত্রে যেটি আগম-তথ্যের (input) ভূমিকা পালন করে। ঐ আগম-তথ্য নিয়ে, একটি নির্দিষ্ট 'প্রাথমিক দশা' থেকে কাজ শুরু করে যন্ত্র । তার পর পরিকল্পন অনুযায়ী ধাপে ধাপে এগুতে থাকে গণন-কার্য। এবারে দুটি ভিন্ন ঘটনা ঘটতে পারে। এক, গণনার কোন এক পর্যায়ে এসে এমন এক পরিস্থিতি উদ্ভূত হতে পারে যেখানে যন্ত্র আর পরবর্তী ধাপে যাওয়ার মত কোন নির্দেশ পেল না তার পরিকল্পনের ভিতরকার নির্দেশ-গুচ্ছ থেকে। এ ক্ষেত্রে গণনার শেষ ধাপ হল গণন-বিরতি (halting)। আর দুই, গণন-বিরতি আর ঘটলই না, অনন্ত পরম্পরায় চলতে থাকল টিউরিং

যন্ত্রটি। এই যন্ত্রের সাহায্যেই অ্যালান টিউরিং 'যন্ত্রীয়' বা 'কার্যকর' প্রক্রিয়ার ধারণাটির এক স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিলেন। আর, এ থেকেই পাওয়া গেল গণন-যোগ্য সংখ্যা ও গণন-যোগ্য ফলন (function)-এর সংজ্ঞাও। সে সময় থেকেই টিউরিং-এর অন্যতম লক্ষ্য ছিল, মানুষের মনের ভিতর যে সব প্রক্রিয়াগুলি সংঘটিত হয়, সেগুলির সঙ্গে যন্ত্রীয় প্রক্রিয়ার তুলনা করা। অবশ্য এটা ছিল একটা আবছা ব্যাপার, যা তাঁর কাজের একটা পটভূমি রচনা করেছিল। আশু লক্ষ্য যা ছিল তা হল, ডেভিড হিলবার্ট বর্ণিত একটি মৌলিক যৌক্তিক সমস্যার সমাধান। অ্যালান টিউরিং, ও যুক্তিবিদ্ অ্যালোঞ্জো চার্চ প্রথম এই সমস্যার সমাধানের পথ দেখান।

প্রকৃত অর্থে টিউরিং-ই হলেন আধুনিক যন্ত্রগণকের ধারণার উদ্ভাবক (উনিশ শ' পঞ্চাশের দশকে ভন নয়ম্যান নির্দেশিত পথে তৈরী হয় প্রথম প্রজন্মের যন্ত্রগণক) - যদিও তাঁর অবদানের উপযুক্ত স্বীকৃতি কোনদিনই পান নি তিনি, তাঁর সেই 'উদ্ভট' ভিন্নধর্মিতার জন্য ।

স্বীকৃতির অভাবই শুধু নয়, মৌলিক গবেষণার কাজেও তিনি বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকেন নানা ভাবে । ফলত, শেষ পর্যন্ত ম্যারাথন দৌড়ে অংশগ্রহণের জন্য তৈরী হতে শুরু করেন তিনি, কারণ তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ দৌড়বীর । 1948-এর লন্ডন অলিম্পিকে দৌড়ের যোগ্যতা অর্জনে অল্পের জন্য ব্যর্থ হন টিউরিং । ফিরে আসেন গবেষণায় । 1950 সালে প্রকাশিত হয় তাঁর সাড়া-জাগানো এক গবেষণা-নিবন্ধ, যাতে তিনি মানব-মননের সঙ্গে যন্ত্রগণকের ক্ষমতার তুলনা করেন, এবং এই ভাবে সূত্রপাত করেন 'কৃত্রিম মনন' (artificial intelligence) নামক বিষয়ে মৌলিক গবেষণার ধারাটির । 1952 সালেই আবার সম্পূর্ণ নতুন আর একটি বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় তাঁর - জীবন-বিজ্ঞানে অবয়ব-গঠনের সমস্যাটির ওপর গাণিতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন আলোকপাত করেন তিনি - ভাবীকালের জন্য রাখেন এক অমূল্য অবদান । এর পরই নেমে আসে আঘাত ।

সমকামিতার অভিযোগে ইংলন্ডের আদালতে টিউরিং-এর বিচার হয় 1952 সালে । তাঁর পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনের ওপর গড়িয়ে নেমে আসে এক রাশ পাঁক । তাঁকে এক রকম বাধ্য করা হয় নিয়মিত ভাবে রাসায়নিক হর্মোন ইঞ্জেকশন নিতে, যাতে দমিত হয় তাঁর রিপুর 'অবাঞ্ছিত' প্রকাশ। শেষ পর্যন্ত সায়ানাইড বিষে আত্মহননের পথ নেন তিনি, পাশে পড়ে থাকে আধ-খাওয়া এক টুকরো আপেল, যাতে ছিল সায়ানাইড বিষের অবশেষ ।

টিউরিং কি সত্যিই আত্মহত্যা করেছিলেন ? তাঁর পেশার সুবাদে তিনি ছিলেন বৃটিশ সরকারের বহু গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্যের সাক্ষী । সমকামিতার ঝোঁকে সেই সব তথ্য তিনি জানিয়ে দিতে

পারেন অনুসন্ধিৎসু কোন চরকে, এ ভয়ও ত' ছিল সরকারের। তবে, আত্মহত্যা করলেও টিউরিং রেখে গেলেন অসাধারণ এক ছবি, যা হয় ত একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। 'ঈশ্বরের বাগান' থেকে নির্বাসিত হয়েছেন তিনি, 'শয়তানের' প্ররোচনায় ঐ নিষিদ্ধ ফল খেয়ে। তবু শয়তানের পথেই পা বাড়াবেন তিনি, ঈশ্বরের বাগান তাঁর জন্য নয়।

আবার এটাও অসম্ভব নয়, টিউরিং তাঁর কোমল স্বভাবের বশে কিছু মানুষকে একটা বিশ্বাসের সুযোগ তৈরী করে দিয়ে গেলেন, যাতে তাঁরা বিশ্বাস করে শান্তি পান, তিনি মারা গেছেন অসাবধানতার দুর্ঘটনায় । কারণ, তিনি সেই সময় নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন জৈব-রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, জীবন-বিজ্ঞানে তাঁর সেই বিখ্যাত গাণিতিক তত্ত্বের সূত্র ধরে। বিশেষত তাঁর মা ধরে নিয়েছিলেন এমনটাই। সমকামিতার অভিযোগে 'অপরাধী' সাব্যস্ত হওয়ার পরও কিন্তু তাঁর আচরণে স্বভাবসিদ্ধ সজীবতা, রহস্যপ্রিয়তা, ও মৌলিকত্বে ঘাটতি পড়ে নি কখনো, বরং আরো যেন বেড়ে গেছিল তা। জগৎ-সংসারে যা কিছু গুরুতর, যা কিছু নিরেট, জ্ঞানগর্ভ চাকচিক্যের আড়ালে শঠতায় পূর্ণ যা কিছু, তাই নিয়ে তাঁর জীবনের মূল্যে এক অদ্ভুত খামখেয়ালের খেলা খেলে গেলেন অ্যালান ম্যাথিসন টিউরিং।

সরকারী আইন টিউরিং-কে সাজা দিয়ে যে অপরাধ করেছিল, তারই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ 2009 সালে তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন প্রয়াত টিউরিং-এর কাছে সরকারের তরফে থেকে প্রতীকী মার্জনা চেয়ে নিয়েছিলেন, স্বীকার করেছিলেন, টিউরিং-কে অপরাধী সাব্যস্ত করে তাঁর ওপর করা হয়েছিল এক বিরাট 'অন্যায়'।

আন্তর্জালকের কল্যাণে টিউরিং-এর জীবনকাহিনী আজ অনেকেরই জানা (আমিও সে ভাবেই জেনেছি)। বিখ্যাত 'নেচার' পত্রিকা টিউরিং-এর জন্মশতবর্ষে প্রকাশ করেছে এক বিশেষ সংখ্যা, যাতে রয়েছে তাঁর জীবন ও গবেষণার বহু দিক নিয়ে নানান আলোচনা। যে টিউরিং-কে সরকারী আইন একদিন অপরাধী সাব্যস্ত করেছিল, আজ সেই তিনিই এক কিংবদন্তী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোন একজন মাত্র মানুষের যদি নাম করতে হয় যিনি মিত্রশক্তির জয়ের পছনে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, তবে সম্ভবত তিনি হবেন অ্যালান টিউরিং, কারণ তিনিই জার্মান 'এনিগ্মা' (এই কথাটির অর্থ হল, রহস্য বা হেঁয়ালী) যন্ত্র থেকে উদ্ভূত কূট-সংকেতগুলির পাঠোদ্ধার করেছিলেন। এই নিবন্ধে আমি তাঁর জীবন ও গবেষণার প্রসঙ্গ ধরে দুটি বিষয় শুধু তুলে ধরতে চাই। দুটি প্রশ্ন, যার নিরসন হয় ত' হবে আগামী দিনে বহু আলোচনা ও বিতর্কের

পর। কিংবা, হয় ত' তাও হবে না কোনদিনই। প্রশ্ন দুটি অবশ্যই আমার নিজের মৌলিক কোন চিন্তার ফসল নয়, আমি শুধু এই নিবন্ধের পাতায় উপস্থিত করছি তা।

প্রসঙ্গত, টিউরিং-এর জীবনের সঙ্গে অনেকটাই মিল রয়েছে আইরিশ কবি ও নাট্যকার অস্কার ওয়াইল্ডের (1854-1900) জীবনকাহিনীর। ওয়াইল্ড পরিচিতি লাভ করেছিলেন তাঁর বহুসংখ্যক তীক্ষ্ম, বিচিত্র উক্তির জন্য, যা আজও উদ্ধৃত হয় নানান প্রসঙ্গে। তাঁর 'ডোরিয়ান গ্রে' উপন্যাসটি নিয়ে বিতর্ক তৈরী হয়েছিল, কারণ এতে নাকি ধরা পড়েছিল ওয়াইল্ডের অবক্ষয়ী জীবনদর্শন। নাট্যকার হিসেবে ওয়াইল্ডের খ্যাতি যখন তুঙ্গে সেই সময়েই, 1895 সালে, আদালতে তাঁর বিচার হয় পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর 'অত্যন্ত অশোভন' ঘনিষ্ঠতার অভিযোগে। দণ্ডিত হন দু' বছর সশ্রম কারাদণ্ডে। এর পর বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত দশায় মৃত্যু হয় ব্যতিক্রমী মানুষটির।

ওয়াইল্ডের মা ছিলেন সংগ্রামী মহিলা, এবং তাঁর জন্যও শেষ জীবনে অপেক্ষা করেছিল যন্ত্রণা ও দুঃখ। তিনি যখন ছেলেকে পরামর্শ দেন আইনী অভিযোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামার, হতাশ অস্কার তখন বলেন, 'ট্রেন ছেড়ে চলে গেছে, সময় আর নেই ...'।

অবশ্য অ্যালান টিউরিং ও অস্কার ওয়াইল্ডের মানসিকতায় যে বড় একটা সাদৃশ্য ছিল, তা বলা যায় না। দু' জনের ভাবনায় ও আচরণে 'সংশোধনযোগ্য' কিছু ছিল কিনা, মনোবিজ্ঞানী ও মনোরোগবিশারদরা তা নিয়ে অনুসন্ধান করতেই পারেন (যেমন, অস্কার ওয়াইল্ডের বেলায়, স্বল্পবয়সীদের সান্নিধ্য অর্জনের আগ্রহ)। তবে, দু' জনের জীবন-ইতিহাসই একটা প্রশ্ন তীক্ষ্ম ভাবে সম্মুখে নিয়ে আসে : ব্যক্তি-মানুষের যৌনতা, আর মেধা, এ দুইএর ভিতর কোন জটিল ও নিগূঢ় সম্পর্ক আছে কি?

এ প্রশ্নের আলোচনা কতটা 'জরুরী', কতটা 'হিতকর', আর কতটাই বা এর উত্তর পাওয়া সম্ভব, তা আমি জানি না। এই মুহূর্তেই হয় ত' বহু সংখ্যক গবেষক এই প্রশ্ন নিয়ে গভীর চর্চা করে চলেছেন। এ নিয়ে এই নিবন্ধের পাতায় কোন আলোচনা বা আলোকপাতের প্রশ্নই ওঠে না। তবু, একটা কথা থেকেই যায়।

যৌনতা, আর মেধা, এই দুটি বিষয়েরই সম্যক উপলব্ধি থেকে আমরা বহু যোজন দূরে। আর, এই উপলব্ধিহীনতা থেকে উদ্ভূত হয়েছে, হচ্ছে, এবং হবে বহু বহু বিভ্রাট, বিপর্যয়, সীমাহীন অন্যায়। যৌনতাকে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের বোঝার প্রচেষ্টা অবশ্য আজকের নয়, বহু

যুগের। এই গ্রহের বহু দেশে মানুষের যৌন আচরণ সংক্রান্ত বিপ্লবও সাধিত হয়েছে বিগত কয়েক দশকে। এটা একটা বিরাট তাৎপর্যের বিষয় ঠিকই, তবু আমার মনে হয় (জানি না, এই মনে হওয়া কতটা সঠিক), এটাকে বলা যেতে পারে এক ধরনের বহিরঙ্গের বিপ্লব। আবার এই বহিরঙ্গের বিপ্লবও সংঘটিত হয় নি বহু দেশে, হয় ত' এই সব দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সে রকম কোন বিপ্লব ঘটবে না কোন চেনা ছকে, কারণ ইতিহাসের গতি বিচিত্র। আজ সর্বত্রই তাই, যৌনতার প্রবল অভিঘাতে বিদীর্ণ হয় ব্যক্তি মানুষের সত্তা।

বস্তুত, যৌনতা আর মেধা, এ দুটি যদি হয় ত্রিভুজের দুটি বিন্দু, তবে অপর শীর্ষবিন্দুটি হল ক্ষমতা। কারণ, ক্ষমতার সঙ্গেই অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত যৌনতা আর মেধার সত্তা ও ইতিহাস। এদের একটিকে বাদ দিয়ে অপর দুটির আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। যৌনতা আর উপচে পড়া মেধা, এই দুই মেরুর মাঝে বিস্তৃত ও প্রলম্বিত ছিল টিউরিং-এর ব্যক্তি-সত্তা। আর, শেষ পর্যন্ত ঊর্ধতর ক্ষমতার নিষ্পেষণে অপমৃত্যু হল সেই সত্তার।

যৌনতার নিগূঢ় প্রকৃতি যতটা রহস্যময়, সে তুলনায় মেধা সম্পর্কে গভীর গবেষণা অবশ্য এখন খুব দ্রুত এগোচ্ছে। তবু, সামগ্রিক বিচারে এখনো খুবই প্রাথমিক স্তরেই আবদ্ধ তা। আর, গবেষক গোষ্ঠীর বাইরে এ সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা নেই মানুষের। সমাজ, সংস্কৃতি, প্রশাসন, শোষণ-যন্ত্র, এরা ব্যক্তি-মানুষের মেধার মূল্যায়ন করে ও তাকে 'কাজে' লাগায় সম্পূর্ণ মন-গড়া ধারণার ভিত্তিতে, যার যার স্বার্থ অনুযায়ী, যথেচ্ছ ভাবে। তাই কোথাও বা দেখা যায় মেধা-তন্ত্র আর মেধা-পুজো, আবার তারই পাশে কোথাও বা মেধা-হনন। টিউরিং-এর ভাগ্যে এ দুইয়ের-ই আবির্ভাব ঘটেছিল যেন এক পরাবাস্তব পরম্পরায়।

মেধা মানব-মননের এক 'বিরল' ও 'ব্যতিক্রমী' প্রকাশ (অবশ্য, ঠিক কতটা বিরল বা ব্যতিক্রমী, তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ রয়েছে; অনেক সময়ই একে বিরল ও ব্যতিক্রমী বলা হয় মেধা সম্পর্কে যথেষ্ট স্বচ্ছ ধারণার অভাবে, এবং নানান সংস্কৃতিগত কারণে)। বিশেষ দৃষ্টান্ত স্বরূপ, অ্যালান টিউরিং-এর মেধা অবশ্যই, প্রচলিত অর্থে, বিরল ও ব্যতিক্রমী। আর, মানব-মননের নানান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একেবারে মৌলিক অনুসন্ধানের এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিলেন স্বয়ং এই টিউরিং-ই, যার সূত্র ধরে হয় ত' আগামী দিনে আরো ভালভাবে বোঝা যাবে মেধার স্বরূপ।

না, মনোবিদ্যার গবেষক ছিলেন না অ্যালান টিউরিং। তবে তিনিই সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন গণন-যোগ্যতার (computability) তত্ত্বের, আর যন্ত্রগণক-বিদ্যার। তাঁরই কাজের সূত্র ধরে সৃষ্টি

হয়েছিল যন্ত্রগণক-বিদ্যার বিশেষ প্রয়োগ-শাখা রূপে কৃত্রিম মননের বিষয়টি। আর, মনোবিদ্যা, যন্ত্রগণক-বিদ্যা, কৃত্রিম মনন, ও এ সবের সঙ্গে, নানান দার্শনিক ভাবনা, সব মিলিয়ে তৈরী হয়েছে বোধ-বিজ্ঞান (cognitive science) নামে আর এক সাম্প্রতিক গবেষণা ক্ষেত্র।

যান্ত্রিক গণনক্ষমতা আর মানব-মননের ভিতর তুলনা চলে কিনা, সে প্রশ্নটি প্রথম অনেকটা সুনির্দিষ্টতা সহ তুলে ধরেন তিনি। তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, যন্ত্রগণকের গণনক্ষমতার সীমা নির্ধারণ। কী সর্ত সাধিত হলে যন্ত্রগণককে মানুষের মত মনন-ক্ষমতার অধিকারী বলা যাবে, সে সম্পর্কে প্রস্তাব রাখেন তিনি। এটিই পরে পরিচিত হয়েছে 'টিউরিং পরীক্ষণ' নামে। পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্য এটিকে যন্ত্রের মনন-ক্ষমতার পরিচায়ক সর্ত বলে মেনে নিতে পারেন নি অনেকে। কৃত্রিম মনন আর মানব-মননের সূত্র ধরেই এই নিবন্ধের দ্বিতীয় প্রসঙ্গে আসবো, তবে তার আগে আর একটা কথা বলে নিতে চাই, যদি ধৃষ্টতা না হয়।

যৌনতা আর মেধার ভিতরকার বিসর্পিল সম্পর্ক যদি অনুসন্ধানের বিষয় হয়, তবে ব্যতিক্রমী যৌনতার সঙ্গে মেধার সম্ভাব্য সম্পর্ক আরো গভীর এক অনুসন্ধানের বিষয়। এ কথা বলছি, কারণ টিউরিং ও অস্কার ওয়াইল্ড দু' জনেই, প্রচলিত অর্থে, ব্যতিক্রমী যৌনতার নজির। অবশ্য ব্যতিক্রমী যৌনতা যাকে বলছি, তা কী অর্থে ব্যতিক্রমী, কতটা 'স্বাভাবিক' বা কতটা 'অস্বাভাবিক' তা, সে নিয়ে তীব্র প্রশ্ন উঠতেই পারে। বস্তুত, প্রচলিত অর্থে যা কি না ব্যতিক্রমী যৌনতা, তার পক্ষ নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন চলছে, আরো বহু দিন হয় ত' আরো প্রবল আন্দোলন চলবে। কারণ, আন্দোলন ছাড়া ত' ধারণার অচলায়তন ভাঙে না। অবশ্য তার জন্য প্রয়োজন, রাজনীতির সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে সমাজ মানসের গভীরতর ক্ষেত্রে আন্দোলনের বিস্তার। কিন্তু এটাও তেমনই ঠিক যে, শুধু আন্দোলনে কোন গভীর প্রশ্নের চূড়ান্ত বা সুষ্ঠু সমাধান হয় না। আন্দোলন কোন প্রশ্ন বা সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্র তৈরী করে দেয় ঠিকই, কিন্তু প্রকৃত নিরসন যদি কখনো ঘটে, তবে তা হয় নিরপেক্ষ বিচার আর গভীর অনুসন্ধানের ভিতর দিয়েই, আন্দোলনের অ-সহিষ্ণুতায় যার কোন জায়গা থাকে না। অথবা, 'আন্দোলন' কথাটিকে এ রকম গতানুগতিক ভাবেই বা ভাবার প্রয়োজন কি? বিশদ গবেষণা ও অনুসন্ধানও ত' হতে পারে আন্দোলনের উন্নততর রূপ। ব্যতিক্রমী যৌনতার সঙ্গে মেধার সম্পর্ক যদি কিছু থাকে তবে তা নিয়ে সে রকমই সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ম অনুসন্ধান প্রয়োজন, কারণ তাতে অনেক টিউরিং আর অনেক অস্কার ওয়াইল্ডের মেধার অপমৃত্যুর বদলে তাঁদের অবদানে সমৃদ্ধ হবে মানুষের জীবন ও ইতিহাস।

এবারে সেই দ্বিতীয় প্রসঙ্গ, যার সূচনা হয়েছিল স্বয়ং টিউরিং-এর হাত ধরে: যন্ত্র-মননের পক্ষে কি মানব-মননের সমকক্ষ হওয়া সম্ভব ? এটিই সেই বহু-আলোচিত কৃত্রিম মনন বিতর্ক, যা আজ দুটি শিবিরে ভাগ করে দিয়েছে এ বিষয়ে আগ্রহী অসংখ্য মানুষজনকে । এঁদের ভিতর রয়েছেন দার্শনিক, গাণিতিক, যুক্তিবিদ্, পদার্থবিদ্, যন্ত্রগণক-বিশারদ, বোধ-বিজ্ঞানী, ও আরো অনেকে । আর, হয় ত' এই দুটি শিবিরে বিভাজনের জন্যই কিছুটা ধাক্কা খেয়ে যাচ্ছে, এ বিষয়ে নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের ধারাটি । তবে এ কথাও ঠিক, বোধ-বিজ্ঞানের অন্যতম কেন্দ্রীয় প্রশ্ন এটি, এবং এ নিয়ে বিগত কয়েক দশক ধরে ব্যাপক গবেষণা ও অনুসন্ধান হয়েছে । উত্তরের একটা অত্যন্ত প্রাথমিক আর আবছা রূপরেখাও হয় ত' দেখা যাচ্ছে । তবে এমনও হতে পারে, যে প্রশ্ন নিয়ে শুরু হয়েছিল উত্তর খোঁজা, আর যে উত্তর শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে, তাদের ভিতর হয় ত' মিল থাকবে না তেমন একটা ।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, এই উত্তর পেয়ে মানুষের লাভ কী হবে ? অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা, শোষণ, নির্যাতন কমবে কি ? না কি নির্মম শোষণ-যন্ত্রের হাতে এটা হয়ে উঠবে স্থায়ী দাসত্ব কায়েমের আর একটা হাতিয়ার ? আমার মনে হয়, এ রকমটা হওয়া অসম্ভব নয় । মানুষের অন্ন-বস্ত্রের কথা ভেবে কে আর কবে বিজ্ঞান করেছে? অবশ্য, ভবিষ্যৎ পুরোপুরি অতীতের ছাঁচে ঢালাই হয় না । তবে দৃষ্টান্ত রূপে বলা ভুল হবে না, পরমাণুর গঠন ও জীনের গঠন সংক্রান্ত গবেষণার বেলায় কিন্তু 'মানব-কল্যাণে' এদের ভূমিকা রাহুগ্রস্ত হয়েছে পর্বতপ্রমাণ মুনাফার স্বার্থে আর সামরিক স্বার্থে এদের প্রয়োগে ।

অবশ্য এ কথাও একই সঙ্গে বলতে হয়, শোষণ-যন্ত্রের বিরোধিতা যাঁরা করেন, তাঁরা যদি বিজ্ঞানের এ সব গভীর প্রশ্ন ও অনুসন্ধান এড়িয়ে চলেন, চলতেই থাকেন, এগুলিকে নিজের করে নিতে না পারেন, তবে কিন্তু শোষণ চলতে থাকবে, চলতেই থাকবে । দাসত্ব কায়েম হতেই থাকবে । মানুষের অনুসন্ধানের স্পৃহা সম্ভবত কোনদিনই লোপ পাবে না, সে অনুসন্ধানের ফল যদি মর্মান্তিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবু । সুবিধার জন্য, একটু সরলীকরন করে নিয়ে ভাবা যাক, মানব জাতি দুটি শিবিরে বিভক্ত । একটি হল শোষণ ও অবদমনের শিবির, আর অপরটি শোষিত মানুষের শিবির (এই সরলীকরন আদৌ খাটে কি না, সে প্রশ্ন না হয় মুলতুবী থাক)। সে ক্ষেত্রে, ইতিহাস কিন্তু বলছে, মেধা ও গবেষণার ওপর প্রায় একচেটিয়া অধিকার ঐ প্রথমোক্ত শিবিরটিরই। দ্বিতীয় শিবিরের মানুষজন, তাঁদের নেতৃবৃন্দ, মেধা ও গবেষণাকে বরাবরই দেখে

এসেছেন সন্দেহ আর সংশয়ের চোখে। অনুসন্ধানের যে স্পৃহা মানব-মনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য, তাকে বুঝতে চান নি কোনদিন।

বস্তুত মেধাকে 'কাজে' লাগানোর প্রশ্নটি পুরনো হতে পারে, কিন্তু তাতে তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কমে না। ক্ষমতা ও সম্পদ যাঁদের হাতে, তাঁরা মেধার গুরুত্ব যতটা বোঝেন, মেধাকে যে ভাবে সোনা দিয়ে কিনে নেন, যে ভাবে কাজে লাগান তাকে, শোষিত মানুষ, বা সেই শোষিতদের হয়ে যাঁরা সংগ্রাম করেন তাঁরা কিন্তু মেধাকে বোঝেন না তার এক শ' ভাগের এক ভাগও। মেধা সম্বন্ধে অসম্ভব রকম সন্দিহান তাঁরা, কারণ তাঁদের ভীতি, হয় ত' বা তাঁদের আন্দোলনের ভিতরই তৈরী হয়ে যাবে এক ধরনের মেধা-তন্ত্র। আর এটাও ঠিক, তাঁদের হাতে সম্পদ কম, তাই প্রচলিত পথে মেধাকে 'কাজে লাগান' সম্ভব হয় না তাঁদের পক্ষে। শোষিত মানুষের কাছে মেধা তাই একটা ঐশ্বরিক ব্যাপার, একটা দূরের ব্যাপার, যদিও তাঁদের ভিতর থেকেই মেধাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় বা কিনে নিয়ে যায় শোষক শক্তি।

যাক সে কথা। অনেক বড় প্রসঙ্গ এসে যাচ্ছে, যার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত আমার এই নিবন্ধের কলম। এবারে ফিরে আসি কৃত্রিম মননের সেই কেন্দ্রীয় প্রশ্নে, যার সূচনা করেছিলেন স্বয়ং টিউরিং। তিনিই অনেকটা নির্দিষ্ট ভাবে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, যন্ত্র-মনন আর মানব-মননের ভিতর হয়ত' তেমন কোন অভেদ্য সীমারেখা নেই। যন্ত্র-মনন আর মানব-মননের ভিতর তুলনা করার একটা উপায় তিনি নির্দেশ করেছিলেন। এটিই পরে পরিচিত হয়েছে 'টিউরিং পরীক্ষণ' নামে। আবার পরবর্তী পর্যায়ে এই টিউরিং পরীক্ষণকে অনেকে ঠিক মেনেও নিতে পারেন নি। এখানে এসে যাচ্ছে সেই দুই শিবিরের ব্যাপার, যার একটিকে নাম দেওয়া যায় যন্ত্রবাদী বা 'বাস্তববাদী' (pragmatic) শিবির, আর অপরটি হল 'সংশয়বাদী' শিবির। বলা যায়, টিউরিং-এর কাজ থেকেই গোড়াপত্তন হয়েছিল প্রথমটির, আর দ্বিতীয়টির আবির্ভাব বহুদিন আগে থেকেই ('যন্ত্রের ক্ষমতা ত' মানুষেরই দেওয়া, যন্ত্র তা হলে মানুষের সমান হয় কি করে ?')। এই দ্বিতীয় শিবিরের পরিচিত প্রবক্তা হলেন বিখ্যাত গাণিতিক রজার পেনরোজ। আরো বহুসংখ্যক চিন্তাবিদের অবস্থানও এই শিবিরে। আর, অসংখ্য 'সাধারণ' মানুষও কিন্তু বস্তুত এই শিবিরেই, যাঁদের পক্ষে খবর রাখা সম্ভব নয়, বাস্তববাদীরা কত দ্রুত এগিয়ে চলেছেন তাঁদের বহুমুখী গবেষণার পথ ধরে।

আসলে এটা একটা আবেগের ব্যাপার। যন্ত্র ত' তার থাবা বসিয়েছে সব কিছুতেই। তাই, ভাবতে ভাল লাগে, মানব-মনের প্রায়-ঐশ্বরিক মহিমা নিশ্চয় যন্ত্রের নাগালের বাইরে। ঐ একটা

জায়গায় না হয় নাই বা পৌছল যন্ত্রের স্পর্ধিত হাত । পেনরোজ এক বিশাল মাপের গাণিতিক । তাঁর হাত ধরে এই সামান্য ও শেষ নিশ্চয়তাটুকু পেতে ভাল লাগে । কিন্তু আবেগ যা বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত হতে চায়, বাস্তবের জয়রথ প্রায়ই তাকে নির্মম ভাবে আঘাত করে সরিয়ে দেয় পথের পাশে । বাস্তববাদীরা কিন্তু নির্বোধ নন।

একটা তুলনা মনে আসে । কোয়ান্টাম তত্ত্বের জয়রথ যখন এগিয়েছিল অমোঘ গতিতে, তখনো সংশয়বাদীরা বলেছিলেন, এটা অনেক পর্যবেক্ষণকে ব্যাখ্যা করছে ঠিকই, কিন্তু এর ভিতর নিশ্চই কোন ফাঁক আছে, কারণ চিরায়ত 'বিশ্ব-দর্শনের' সঙ্গে মিলছে না এটা । সেই শিবিরের পুরোভাগে সেবারে ছিলেন স্বয়ং আইনষ্টাইন ও শ্রোয়েডিঙ্গার । আর, বাস্তববাদী শিবিরে ছিলেন এক ঝাঁক তরুণ পদার্থবিদ্ ও পরবর্তী পর্যায়ে এক ঝাঁক যন্ত্রগণক-বিশারদ ।

এই সব তরুণ বিজ্ঞানীরা 'বিশ্ব-দর্শনের' পিছুটান বোধ করতেন না, আর তাই প্রচুর আত্মবিশ্বাসে ভর করে কোয়ান্টাম তত্ত্বের জয়রথকে এগিয়ে নিয়ে যেতে দ্বিধা করেন নি তাঁরা । অবশ্য আইনষ্টাইন বা শ্রোয়েডিঙ্গারের বক্তব্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করার মত নির্বোধও তাঁরা ছিলেন না । তাই প্রবীণ বিজ্ঞানীদের আপত্তির জায়গাগুলিকে তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করেই এগিয়েছিলেন তাঁরা। কোয়ান্টাম তত্ত্ব আজ তাই উপনীত হয়েছে কোয়ান্টাম তথ্য-বিদ্যার (quantum information theory) পর্যায়ে, যেখানে সম্ভব হয়েছে কোয়ান্টাম কূট-বিদ্যা (cryptography) আর কোয়ান্টাম গণন-বিদ্যা (computation) । আর, কোয়ান্টাম তত্ত্বের এই নতুন ফসলগুলিকে সোনার দামে কিনে নিয়েছে ও নিচ্ছে দানবাকৃতির বিশাল সব আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আর তার চাইতেও দানবীয় সমর-প্রতিষ্ঠানগুলি । মনে হয়, সন্ত্রাসী শক্তিগুলির বিপুল অর্থ আর পেশী-শক্তিও খুব একটা পিছিয়ে নেই এই দখলদারীর বাজারে । অসাধারণ মেধাবী বিজ্ঞানীদের নিরলস গবেষণার ফল এভাবেই 'কাজে' লাগবে, এটাই বোধ হয় নিয়তি, কারণ মেধা মানব-সমাজের কাছে একটা গূঢ় রহস্য, যার ফলে মেধা শুধুই কেনাবেচার সামগ্রী ।

কৃত্রিম মননের বেলায় সংশয়বাদীদের পুরোভাগে রয়েছেন রজার পেনরোজ । নানান সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে পেনরোজ দেখিয়েছেন, মানব-মস্তিষ্কের গাণিতিক বিশ্লেষণের যে ক্ষমতা, যন্ত্রের পুরোপুরি সে ক্ষমতা থাকা সম্ভব নয়, আর সেই সূত্রেই তিনি বলেছেন, মানব-চেতনা (consciousness) এমন এক ক্ষমতা, যা যন্ত্রের নাগালের বাইরে । এখানে পেনরোজ শুরু করেছেন যে জায়গা থেকে তা হল, যন্ত্রের ক্ষমতা সম্পূর্ণই নির্ভরশীল অবরোহী (deductive) যুক্তি-শৃঙ্খলের উপর । গাণিতিক

কুর্ট গোয়েডেল তাঁর নামাঙ্কিত বিখ্যাত উপপাদ্যে দেখিয়েছিলেন অবরোহী যুক্তির সীমাবদ্ধতা। স্বয়ং টিউরিং দেখিয়েছিলেন, তাঁর কল্পিত নির্বিশেষ টিউরিং যন্ত্রে (universal Turing machine; এটিই আধুনিক যন্ত্র-গণকের কল্পিত আদি রূপ) গণনবিরতির সমস্যাটির (halting problem; এই সমস্যাটির আবিষ্কর্তা টিউরিং-ই; ডেভিড হিলবার্ট বর্ণিত যে মৌলিক যৌক্তিক সমস্যাটির কথা আগে উল্লেখ করেছি, সেটিকেই রূপান্তরিত করে এই সমস্যাটি উপস্থাপিত করেছিলেন তিনি) কোন সার্বিক সমাধান নেই। পেনরোজের বক্তব্য, যান্ত্রিক ও অবরোহী যৌক্তিক প্রক্রিয়ার এই সীমাবদ্ধতা কিন্তু শৃঙ্খলিত করে না মানব-মননকে।

মানব-মনন অনেক সময়ই কাজ করে আরোহী যুক্তিপ্রকরণের (inductive reasoning) সাহায্য নিয়ে। আরোহী যুক্তির ব্যাখ্যা কোনদিনই দিতে পারে নি চিরায়ত দর্শন। তাই আরোহী যুক্তির সমস্যাটিকে বলা হয়েছে 'দর্শনের কেচ্ছা' (scandal of philosophy)। তবে কি এখানেই নির্দিষ্ট হবে যন্ত্র-মননের অন্তিম অলঙ্ঘ্য সীমানা, যেখানে লেখা থাকবে 'আর নয়, এবারে শুরু হল মানব-মননের একক সাম্রাজ্য' ?

বাস্তববাদীরা কিন্তু অল্পে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন। তাঁরা বস্তুত গ্রহণ করলেন দার্শনিক ডেভিড হিউমের অবস্থান। এই হিউমই প্রথম আরোহী যুক্তির সমস্যাটি নিয়ে বিশদ বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেন, এবং শেষ পর্যন্ত বলেন, আরোহী যুক্তিকে একটা ব্যবহারিক পথ ও পদ্ধতি হিসেবে মেনে নিতে তিনি রাজী আছেন। আসলে মানুষ বাস্তব জগতে সর্বদাই আরোহী যুক্তি কাজে লাগায়, কারণ কাজে না লাগালে তার চলে না। 'প্রাতঃস্মরণীয় মুখ্যমন্ত্রী আজ পর্যন্ত কোনদিন হাসেন নি, সুতরাং আগামী কালও তিনি হাসবেন না', বিশুদ্ধ যুক্তির বিচারে এটা বলার কিন্তু সত্যিই কোন জায়গা নেই। তবু আমরা এ ভাবেই ভেবে থাকি। আর এ ভাবেই কিন্তু কাজ চলে। শুনতে হয় ত খারাপ লাগবে, বিজ্ঞানের বিশাল আপাত-নিখুঁত কাঠামোটিও কিন্তু তৈরী হয়েছে এ ভাবেই, যদিও বিজ্ঞানের জগতে সর্বদাই অবরোহী যুক্তি আর পর্যবেক্ষণের সাহায্যে আরোহী যুক্তির সিদ্ধান্তগুলিকে যাচাই করে নেওয়ার একটা ব্যাপার থাকে।

বাস্তববাদী বোধ-বিজ্ঞানীরা যন্ত্র-মননের ওই 'অলঙ্ঘ্য' সীমা লঙ্ঘন করেছেন এ ভাবেই, আর এ ভাবেই তাঁরা যন্ত্র-মননকে 'অস্বস্তিজনক' দ্রুততার সঙ্গে এনে ফেলছেন মানব-মননের সঙ্গে তুলনীয় অবস্থানে। মানব-মনে আরোহী যৌক্তিক ক্রিয়া যে ভাবে সংঘটিত হয় তাকে নানান ছোট ছোট সম্ভাব্য উপ-প্রক্রিয়ায় ভেঙে ফেলে সেগুলি নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছেন তাঁরা। সেগুলির এক

একটি প্রতিরূপ (model) তাঁরা পরখ করে দেখেছেন যন্ত্রগণকে নানান পরিকল্পন-সঞ্জাত ক্রিয়া সম্পন্ন করে। যেমন, তাঁরা দেখেছেন, মানব-মনে আরোহী যৌক্তিক ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার একটা বাস্তব উপাদান হল, নানান ছোট ছোট হ্রস্ব-নির্দেশ (heuristics)। 'অমুককে দিয়ে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন একটা দরকারী কাজ করিয়ে নিতে হবে? ঠিক আছে, ওকে ওর পছন্দমত একটা দামী উপহার দাও'। কাউকে দিয়ে কিছু করিয়ে নিতে হলে একটা দামী উপহার অনেক সময় ফলপ্রসূ হয়, এটা একটা হ্রস্ব-নির্দেশ। কিছু মানুষের অভিজ্ঞতায় যে ভাবেই হোক, এই ধারণা তৈরী হয়েছে, এবং এটা তাঁরা বাস্তবে প্রয়োগও করে থাকেন। কাউকে দিয়ে কিছু করিয়ে নেওয়া, আর তাকে উৎকোচ দেওয়া, এই দুই ঘটনার ভিতর নানান আণবিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁদের মনের ভিতর একটি অন্বয় স্থাপিত হয়েছে। যে ব্যক্তি এই হ্রস্ব-নির্দেশটি লাভ করলেন তিনি এবারে সেটি প্রয়োগ করতে থাকবেন, এবং তাতে ফল পেলে সেটি তাঁর মনন-প্রক্রিয়ার একটি দীর্ঘস্থায়ী উপাদানে পরিণত হবে।

বোধ-বিজ্ঞানীরা মানব-মননে এ রকম হ্রস্ব-নির্দেশ ও অনুরূপ নানান উপাদানের গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা করে চলেছেন, এবং নানান উদ্ভাবনী পথে যন্ত্রগণকের সাহায্যে এগুলিকে অনেকটাই 'বাস্তবায়িত' করেছেন। মনন প্রক্রিয়ার এ রকমই আর একটি আদি উপাদান হল সাদৃশ্য (analogy) সন্ধান। তবে এ আলোচনায় বেশী দূর গিয়ে লাভ নেই। শুধু জানা দরকার, বোধ-বিজ্ঞানীরা খুব বেশী উচ্চাকাঙ্ক্ষী না হয়ে, মনন ক্রিয়ার একটা সামগ্রিক ও বিদগ্ধ দর্শন তৈরীর চেষ্টা না করে, এ রকম অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট সূত্র ধরে এগিয়ে চলেছেন বেশ সাফল্যের সঙ্গেই।

এর চাইতে দুঃখজনক আর কিছু হতে পারে না যে, তাঁদের অসাধারণ মেধার এই ফসল সম্ভবত শেষ পর্যন্ত সোনার মূল্যে 'কাজে' লাগাবে শোষক ও সন্ত্রাসী শক্তি । এটাই ইতিহাস।

তবে, যে ভাবে বললাম তাতে একটা ভ্রান্ত ধারণা তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে, কারণ মনে হতে পারে, সংশয়বাদী শিবিরের বোধ হয় ত' এবারে পাততাড়ি গোটানোর সময় এসে গেছে। এ রকম ধারণা দেওয়া কিন্তু সত্যিই আমার অভিপ্রেত নয়। প্রথমত, বোধ-বিজ্ঞান বা গণন-বিজ্ঞানের কিছুই আমি জানি না (তবু আমি চাই এই সামান্য নিবন্ধে টিউরিং-এর প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করতে), আর দ্বিতীয় কথা, যন্ত্র-মনন আর মানব-মননের ভিতর পার্থক্য এখনো বহু যোজন, প্রায় কল্পনার বাইরে। এটা ঠিক, মানব-মননের অনেকগুলি দিক আজ যন্ত্রগণকের সহায়তায় 'বাস্তবায়িত' করা সম্ভব হয়েছে, যার ভিতর রয়েছে আরোহী যুক্তি-প্রকরণের কিছু নজির। আর,

এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, এ সব সম্ভব হয়েছে যন্ত্রগণকের নতুন নানান 'স্থাপত্য' উদ্ভাবনের মাধ্যমে, যাতে করে প্রায় আমূল বদলে গেছে যন্ত্রগণকের ক্রিয়া-শৈলী। আগামী দিনে, কোয়ান্টাম গণন-বিদ্যার প্রয়োগে যন্ত্র-গণকের কার্যকারিতা যে জায়গায় পৌছবে তা সব রকম কল্পনারই বাইরে। কিন্তু তবু এ কথা বলার কোন অর্থ নেই যে সংশয়বাদীরা ভ্রান্ত। আর, এ ভাবে ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত নির্ণয় করা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যও নয়। মানব-মননের বিসর্পিল যাত্রাপথের কোন বাঁকে অপেক্ষা করে রয়েছে কত নতুন ও বিচিত্র সম্ভাবনার অবয়ব তার আগাম হদিশ কেউই দিতে পারে না। স্বয়ং টিউরিং-এর পক্ষেও সম্ভব হত না তা।

যন্ত্র-মননের ব্যাপারে টিউরিং-এর অবস্থান খুব চট করে বা সহজে বলা যাবে না । কারণ অসাধারণ ইঙ্গিতবহ কিছু কথা ছাড়া এ বিষয়ে বিশদে কিছু বলার সময় পান নি তিনি । এক দিকে তিনি ছিলেন প্রথম প্রজন্মের এক বাস্তববাদী, কারণ যন্ত্র-মনন আর মানব-মননের ভিতর কোন অলঙ্ঘ্য সীমানা তিনি স্বীকার করেন নি। অন্তত তাঁর নানান রচনা থেকে এ রকম ধারণা করা যেতেই পারে। আবার সেই তিনিই দেখিয়েছিলেন, নির্বিশেষ টিউরিং যন্ত্র গণনবিরতির সমস্যাটির কোন সমাধান দিতে পারে না। তাঁর গবেষণা জীবনের গোড়ার দিকে, 1939 সালে, যন্ত্র-মনন আর মানব-মননের পার্থক্য নির্দেশের কথা মাথায় রেখে তিনি 'দৈবদ্রষ্টা' (oracle) যন্ত্রের কথা কল্পনা করেন, যদিও তিনি বলে নেন, এটা সঠিক অর্থে কোন যন্ত্র নয়। যে সব যৌক্তিক প্রক্রিয়া টিউরিং যন্ত্রের নাগালের বাইরে, দৈবদ্রষ্টার ক্রিয়া বিস্তৃত সেই সব ক্ষেত্রে (পরবর্তী পর্যায়ে একটা সুনির্দিষ্ট গাণিতিক সংজ্ঞা সহযোগে এই দৈবদ্রষ্টার ধারণাটির কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে)। প্রশ্ন জাগে, আরোহী যুক্তির সমস্যাটির ব্যবহারিক সমাধান কি ভাবে সংঘটিত হয় মানব মনে, টিউরিং কি অবহিত ছিলেন সে বিষয়ে ? আমার মনে হয়, অবশ্যই সে জায়গায় পৌছতেন তিনি । কিন্তু সময় পেলেন না । পড়ে রইল আধ-খাওয়া আপেল ... ।

টিউরিং তাঁর কাজের মাধ্যমে আলোক-উদ্ভাসিত করে গেছেন মানুষের চিন্তার দিগন্তকে । আর স্মৃতির বিষণ্নতা ? সেটাও ত' বিধিলিপি ।

সূত্র:

1. টিউরিং-এর জীবন, গবেষণা ও তাঁর অন্তর্জগৎ নিয়ে বিশদ, অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন অ্যান্ড্রিউ হজেস, নিচের গ্রন্থে (তবে এ বই পড়ার সৌভাগ্য আমার হয় নি এখনো; আমার এ সামান্য নিবন্ধ কোন প্রামাণ্য রচনা নয়, টিউরিং-এর প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন মাত্র):

Hodges, A., 1983, *Alan Turing: the Enigma*, London: Burnett; New York: Simon & Schuster; London: Vintage (1992); New York: Walker (2000).

2. এই নিবন্ধে আমার প্রধান তথ্য-সূত্র হল নিচের আন্তর্জালক-নিবন্ধটি

Hodges, Andrew, "Alan Turing", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2011 Edition)*, Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/turing/>.

3. আরোহী যুক্তির সমস্যা, আর সে প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক পর্যায়ের গবেষণার ধারণা পাওয়া যাবে নিচের গ্রন্থ থেকে

Holland, John H., Holyoak, Keith J., Nisbett, Richard E., and Thagard, Paul R., *Induction: Processes of Inference, Learning, and Discovery,* M.I.T., USA (1993).

তবে, বলা বাহুল্য, এই নিবন্ধের কিছু আলগা কথা ও সম্ভাব্য নানান ভ্রান্তির দায় একমাত্র আমারই।

আমার বৈদ্যুতিন ঠিকানা: a_l@vsnl.com ।

জুন-জুলাই, 2012.

‘আলোচনাচক্র’, কলকাতা, সংকলন 33, আগস্ট 2012, সংখ্যায় প্রকাশিত।